প্রাচীন সিল্ক রুটের পথে

তনুকা এন্দ

দিল্লী এয়ারপোর্টের থেকে সোজা বাগডোগরা। গন্তব্য পূর্ব সিকিমের জুলুক। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের সময় থেকে চালু প্রাচীন সিল্ক রুটে পথে পড়ে এই ছোট্ট গ্রাম জুলুক। অতীতে তিব্বতের লাসা থেকে নাথু লা পাস হয়ে ভারতের তাম্রলিপ্ত বা এখনকার তমলুক পর্য্যন্ত চলত এই বাণিজ্য সড়ক। সে পথে শুধু সিল্ক নয় চলত আরও নানা সামগ্রীর লেনদেন, এমন কি শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা পর্য্যন্ত। কেমন জায়গা এই জুলুক ? মনের মধ্যে কৌতুহলের পাহাড়। যাই হোক বাগডোগরা থেকে অন্যান্যবারের মত মেয়ের কাছে গ্যাংটক না গিয়ে কর্তা-গিন্নী রওনা দিলাম শিলিগুড়ি; সেখানে এক পুরানো বন্ধু সপরিবারে কোলকাতা থেকে এসে যোগ দেবে।

বন্ধুরা এসে পৌঁছতে রাত বারোটা বাজলো। হৈ হৈ করে স্বাগত জানানো হল তাদের, কর্তা-গিন্নি তার তাদের দুই ছেলে; দুই টিন এজার, বড়জন ষোল আর ছোটজন তেরো। পর দিন সকালে ব্রেকফাষ্ট সেরে টাটা সুমোতে মালপত্র চাপিয়ে সবাই মিলে রওনা দিলাম জুলুকের উদ্দেশ্যে। মাঝবয়সী ড্রাইভারের নাম গাম্বু - জুলুকের বাসিন্দা সে। রংপো হয়ে গ্যাংটকের দিকে না গিয়ে আমরা ধরলাম রংলির রাস্তা; সেখানে জুলুক আর কুপুপ যাবার 'পাস' বানিয়ে এগিয়ে চললাম জুলুকের দিকে।

রংলির পর ক্রমশ চড়াইয়ের রাস্তা। বাতাসে ঠান্ডার ভাব বাড়ছে, কুয়াশাও দেখা দিতে শুরু করেছে। শেষ আধঘন্টা যেন প্রায় মেঘের মধ্যে ভেসে চলা। দশ হাজার ফিট উঁচু জুলুকে পৌঁছে দেখি চারদিক সাদা কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখানে আর্মি ষ্টেশনের নামও বেশ মানানসই - ক্লাউড ওয়ারিয়র্স। দিলমায়া রিসর্টে আগে থেকে বুকিং ছিল। দেখলাম দোতালা বাড়িতে কয়েকটা ছোট ঘর, নিচে সিমেন্ট বাঁধান চাতাল। অবশ্য এত উঁচুতে, এত ছোট জায়গায় এই যথেষ্ট।

চাতালের ওপারে রান্নাঘর কাম ডাইনিং রুম, রিসর্টের সবথেকে আকর্ষণীয় জায়গা। দেওয়ালে সাজানো জুলুকের নানা ট্যুরিষ্ট স্পটের ছবি- তার মধ্যে খুব ভালো লাগলো থাম্বি ভিউ পয়েন্টে তোলা কিছুটা ঘোড়ার মত দেখতে এক জন্তুর ছবি। একে স্থানীয় লোকেরা বলে ঘোড়াল। শুধু ছবির জীব-জন্তু নয় পায়ের কাছেও ঘোরা ফেরা করছিল ভারি সুন্দর দুই কুকুর। গরম ভাত, ডিমের ডালনা খেতে খেতে রান্না ঘরের হৈ -হট্টগোল আর ওমের মধ্যে বসে বাইরে শীতের কথা অনেকটা ভুলে গেছিলাম। কনকনে ঠান্ডায় বেরিয়ে আবার শুরু হল কঁপুনি, হাত ঢুকে গেল জ্যাকেটের পকেটে, টুপি দিয়ে কানটা আরও ভালো করে ঢেকে নিলাম।

পরদিন খুব ভোরে বেরনো, থাম্বি ভিউ পয়েন্ট থেকে সান রাইজ দেখতে হবে। কিন্তু লেট-লতিফ আমরা, কাজেই গন্তব্যে পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেল। কাঞ্চনজংঘাও প্রথমদিকে মেঘে ঢাকা পেলাম। কিন্তু মেঘের ওড়না সরে যেতে ঝকঝকে রূপোলী বরফে ঢাকা কাঞ্চনজংঘাকে দেখার সৌভাগ্য হল। থাম্বি ভিউ পয়েন্ট জায়গাটাও ভারি সুন্দর - পাহাড়ের মাথা লালচে ঘাসে ঢাকা, সূর্য্যের আলোয় তা ভেসে যাচ্ছে, এদিক - ওদিকের বরফের আস্তরণে ঢাকা পাহাড় আর দূরে কাঞ্চনজংঘার বাহার....., সেই পাহাড়ি ভোরের স্মৃতি সকলর মনে স্থায়ী জায়গা করে নিল।

সূর্যোদয় দেখার তাড়ায় ওঠার পথে দেখিনি, আর অনেকটা পথ অন্ধকারেও কেটেছে, তবু জুলুকে নামার পথে নজর করে দেখলাম এখানকার 'ভুলভুলাইয়া'। না লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত ভুলভুলাইয়ার অলিগলি নয়, এটা হল সেই সিল্ক রুট যার কথা মনে মনে এত ভেবেছি। পাহাড়ের ওপর থেকে নিচ পর্য্যন্ত নেমে যাওয়া পেঁচানো ফিতের মত

রাস্তা। এই সিল্ক-রুটের পথে পড়ে যে পাহাড়ী 'পাস', যেমন নাথুলা পাস, তাদের অনেকগুলোর উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফিটের উপর, আর নভেম্বর থেকে এপ্রিল অবধি সেগুলো ঢাকা থাকে বরফে। জুলুক থেকে থাম্বির রাস্তাও চারিদিকে বরফ। এই বরফে - ঢাকা রাস্তায় এক সময় চলত ঘোড়া বা খচ্চরের সার, কত জিনিস বয়ে নিয়ে, ভাবতেই অবাক লাগে।

এই সিল্ক রুট ধরেই আমরা আরও এগোলাম কুপুপের রাস্তায়। কুপুপের পর আর সিল্করুট নয়, সোজা বেরিয়ে যাব গ্যাংটকে। জুলুক থেকে কুপুপ যাওয়ার পথে পড়ে নাথাং ভ্যালি, সাড়ে তের হাজার ফিট উচ্চতায়, সেখানে একরাত থাকা হবে। বেরিয়ে পড়লাম জুলুক থেকে। তল্পি-তল্পা নিয়ে গাম্বুকে ভরসা করে। আবার চললাম থাম্বির রাস্তায়, কিন্তু এবার এগিয়ে গেলাম আরও । যত চড়াই উঠছি, বরফের পরিমাণ বাড়ছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখি চারিদিকের পাহাড় ঢাকা সাদা বরফে, রাস্তার দুধারে জমা বরফ। বরফ দেখে সবাই খুশী, বিশেষতঃ বাচ্চারা, যারা বরফ দেখা বা ছোঁয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

তুষারশুভ্র পাহাড়ের কোলে সর্পিল রাস্তায় ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ী। গাম্বুর তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও পথের একধারে গাড়ি থামানো হল। দলের কয়েকজন ছুটে গেল বরফের গোলা বানাতে। গিয়ে দেখি বরফ যেন সাদা দানার সমষ্টি, অনেকটা শোলার কুচির মত। সেই বরফের গোলা বানিয়ে খেলতে খেলতে কখন উল্টো দিকে এগিয়ে গেছি রাস্তার ধারে লাল-রঙা ঘাসের ছবি তোলার জন্য, সাদা বরফের কোলে তা যেন আগুনের মত জ্বলছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি অনে---ক নিচে নাথাং ভ্যালি। পাহাড়ে ঘেরা বরফের চাদরে মোড়া গেই উপত্যকায় চড়ছে অসংখ্য ইয়াক। ঠিক যেন টেলিভিশনে ডিসকভারি চ্যানেলের দৃশ্য। জনমানবহীন সাদা প্রান্তরে চড়ে বেড়াচ্ছে একদল ইয়াক - অনেক উঁচু থেকে দেখলেও মনে হয় আমরা যেন আচমকা তাদের নিভৃত চারণভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি। কিন্তু বরফে তারা খাবার পাচ্ছে কি করে ? পরে শুনলাম ওরা নাকি বরফ সরিয়ে নিচে ছোট ঘাসের সন্ধান করতে থাকে।

ইতিমধ্যে কখন যেন শুরু হয়ে গেছে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়া। সাদা গুঁড়োয় ঢেকে যাচ্ছে সবার টুপি, জ্যাকেট দস্তানা। রওনা দিলাম তাড়াতাড়ি, একে তো জামা - কাপড় ভিজে যাচ্ছে, আরও জরুরী গাম্বু তাড়া দিচ্ছে, বেশী বরফে গাড়ি পিছলোতে পারে। নাথাং-এ পৌঁছোনোর আগে আবার থামা হল, বাবা হরভজন সিং এর মন্দিরে । আর্মির এই শিখ সৈন্যকে এ অঞ্চলের সবাই খুব মানে, ইনি ১৯৬৮ সালে নাথু লা পাসের কাছে মারা যান। স্বপ্নে উনি এক বন্ধুকে জানান তার মৃতদেহ কোথায় পড়ে আছে, তিনদিন বাদে সেই জায়গা থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। আর তার পর ওঁর স্মৃতিতে মন্দির বানানো হয়। ভারতীয় সেনাদের মধ্যে এরকম প্রবাদ আছে যে ভারত- চীন সীমানা রক্ষায় হরভজন সিং এখনও তৎপর, ওকে নাকি এখনও সীমানার কাছে ঘুরতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়বার থামলাম নাথাং ভ্যালিতে ঢোকার মুখে আর্মি ক্যাম্পে। সেখানে আর্মি ডাক্তারের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ নিতে। এম আই ইউনিটের এই ডাক্তার একজন হাসিখুশি ওড়িয়া মহিলা, আমাদের ফলের জুস খাওয়ালেন ও বারবার বললেন যথেষ্ট পরিমাণে জল খেতে, ঠান্ডায় জল কম খাওয়ার দরুন ডিহাইড্রেশনের ভয় থাকে। এই তেরো হাজার ফিটের উচ্চতায়, ভারতের এই তুষারাবৃত প্রত্যন্ত প্রদেশে বসে সমতলভূমির এক মহিলা ডাক্তারকে দেখে গর্ববোধ করলাম। এরই মধ্যে টের পাচ্ছিলাম কত কঠিন এখানকার জীবন যাত্রা, শীতের দরুর উচ্চতার দরুন, সাধারণ কাজকর্মের নানা অসুবিধা, তাছাড়া যাবতীয় খাবার ও অন্যান্য সরঞ্জাম এখানে নিচে থেকে আনাতে হয়। মনে মনে ভাবছিলাম, দেখ, মেয়েরা কত টাফ হতে পারে।

নাথাং ভ্যালিতে একটা একতলা বাড়িতে একটা বড় ঘরে সবার থাকার বন্দোবস্ত হল। এই উচ্চতায়, ঠান্ডা সকলকেই কমবেশী কাবু করেছে; তার সঙ্গে রয়েছে উচ্চতার দরুন দারুন মাথার যন্ত্রণা আর বমিভাব। দলের

চারজন অবশ্য শীগগিরই একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য তৈরী হয়ে নিল; রয়ে গেলাম দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য আর আমি। গেষ্টহাটসের হাসিখুশি মেয়ে পেমার তত্ত্বাবধানে জ্যাকেট, টুপি, দস্তানা, মাফলার, গামবুটে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে সবাই বেড়িয়ে পড়ল বরফ ভেঙে আশেপাশে টহল দিয়ে আসতে। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি দূ....রে উন্মুক্ত প্রান্তরে চড়ে বেড়াচ্ছে একটা ইয়াক, দলছুট হবে হয়তো। কেমন যেন মন কেমন করা দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ দেখি পেমার সঙ্গে আমাদের চারমূর্তি সেখানে পৌঁছে গেছে, নানান অ্যাঙ্গেলে ফটো তোলা হচ্ছে। ওরা সেখানে একটা ছোট মন্দির দেখে আর ফেরার পথে পেমার বাড়ি হয়ে আসে। পেমার বাড়িতে বুখারির চারপাশে বসে তোলা গ্রুপ ফটো সেদিনকার এক্সপিডিশনের সাক্ষী হয়ে থাকবে। বুখারির কথাটা এখানে একটু বলে নি। লোহার তৈরি চৌকো চারপেয়ে টেবিলের মত একটা কাঠামো। তার নিচে আগুন রাখার একটা জায়গা থাকে। সকলে বুখারির তলায় পা এগিয়ে দিয়ে বসে সেই আগুনের তাত নেয় আর হাত সেঁকে নেয় বুখারির উপরের দিকের তেতে ওঠা লোহার পাতে।

আমাদের দলবল ফেরার পর সবাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছি বেলা তখন আন্দাজ দুটো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মেঘ ডাকার আওয়াজে, সঙ্গে ঝমঝম শব্দ। দৌড়ে গিয়ে দেখি বৃষ্টি নয়, ঝমঝমিয়ে বরফ পড়ছে। বরফ পড়ার সাথে সাথে বিদ্যুতও বেপাত্তা ফলে হিটারও বন্ধ। জেনারেটরের হিটার চালানোর ক্ষমতা নেই। আপাতত কাজ চালানোর জন্য পেমার বোন মিংমা এসে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিল ফায়ার প্লেসে। আঃ কি আরাম। সবাই গিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনের বেঞ্চে বসে হাত - পা সেঁকতে লাগলাম। মিংমা দিয়ে গেল গরম চা আর ধোঁয়া ওঠা নুডল্‌স।

কিন্তু আগুন আর নুডল্‌সের উষ্ণতা সত্ত্বেও সকলের মন বলতে শুরু করেছে নাথাং ভ্যালি থেকে এবার বেরোতে হবে। মাথা ধরা আর ঠান্ডার চোটে প্রায় সবারই হাত পা চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। পরদিন রোদ ঝলমল সকালে তাই অধীর আগ্রহে গাম্বুর অপেক্ষা করছি, গত রাতে যে ফিরে গেছিল জুলুকে নিজের বাড়িতে। অবশেষে দশটা নাগাদ সে হাজির হল; আর্মির লোকেরা রাস্তা পরিস্কার করার পরই আসতে পেরেছে। এবার নাথাং ভ্যালিকে গুডবাই বলে বেরিয়ে পড়লাম কুপুপের উদ্দ্যেশ্যে। প্রচন্ড রোদ, নীল আকাশ, কিন্তু ঝকঝকে রোদে বরফ থেকে ঠিকরানো আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই সকালে কুপুপের পথে সঙ্গীবিহীন আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। চারিদিক সাদা বরফে ঢাকা, যতদূর চোখ যায় তুষাররাজ্য। এসব জায়গার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য - বারবার মনে হচ্ছিল যেন ভৌগোলিক মানচিত্রের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়েছি। জনমানবহীন প্রান্তরে আমরা একা। কুপুপের পথে আমরা পেরলাম লা জেপলা পাস। মনে হল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমির উপর এসে দাঁড়িয়েছি, কারণ পাসের উপর দাঁড়ালে দেখা যায়, কত উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথা যেন একদম আমাদের কাছাকাছি। এখানে গাম্বু আমাদের দেখাল অনেক পাহাড়ের মাঝখানে একটা ন্যাড়া পাহাড়ের একদম মাথায় সাদা চেকপোষ্ট। এটা চিনের খুব কাছে জানতাম, কিন্তু এত কাছে বুঝতে পারিনি।

লা জেপলার একটু দূরে ছোট্ট জায়গা কুপুপ। সেখান থেকে যাওয়া যায় 'হাতী লেক'-এ, উঁচু থেকে যার আকার হাতীর মত লাগে। কুপুপ ছাড়িয়ে কিছুটা পথ গেলে মেমেঞ্চু লেক। গ্যাংটক যাওয়ার পথে শেষ লেক পড়ল ছাংগু লেক। এই হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সত্যিই অতুলনীয়। ইতস্ততঃ বরফে ঢাকা সবুজ পাহাড়ের কোলে বিশাল এই নিস্তরঙ্গ হ্রদ। এদিকে বাঁধান পাড়ে ট্যুরিষ্টরা ঘোরাফেরা করছে, কয়েকজন বেশ সুসজ্জিত ইয়াকের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ইয়াকে চড়া হল না। কারন টিপ টিপ করে নামল বৃষ্টি। অতএব আবার গাড়িতে ওঠ, এবার সোজা গ্যাংটক। সেখান থেকে যাব উত্তর সিকিমে। সেই গল্প আবার আরেক দিন হবে। এবারকার মত জুলুক আর নাথাং ভ্যালির স্মৃতি নিয়েই বিদায় নিই।